সূচিপত্র

অধ্যায়-১ ..... ৭
নীতিমালার নাম, পরিধি ও সংজ্ঞা ৭
১.১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ৭
১.২. সংজ্ঞা ৭
অধ্যায়-২ ..... ৯
রূপকল্প ও উদ্দেশ্য ৯
২.১. রূপকল্প (Vision) ৯
২.২. উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives) ৯
২.২.১. ডিজিটাল সরকার (Digital Government) ৯
২.২.২. ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security) ৯
অধ্যায়-৩ ..... ১১
কৌশলগত বিষয়বস্তু ১১
৩.১. ডিজিটাল সরকার (Digital Government) ১১
৩.২. ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security) ১১
৩.৩. সামাজিক সমতা এবং সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access) ১২
৩.৪. শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation) ১২
৩.৫. দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Skill Development and Employment Generation) ১৩
৩.৬. অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening Domestic Capacity) ১৩
৩.৭. পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management). ১৩
৩.৮. উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity) ১৪
অধ্যায়-০৪ ..... ১৫
নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার, তদারকি এবং পর্যালোচনা ১৫
৪.১. নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার এবং তদারকি (Policy Ownership and Monitoring) ১৫
৪.২. নীতিমালা পর্যালোচনা (Policy Review) ১৫
৪.৩. কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা (Action Plan Review) ১৫
অধ্যায়-০৫ ..... ১৬
কাঠামো ও অনুসৃত রীতি ১৬
৫.১. কাঠামো (Structure) ১৬
৫.২. অনুসৃত রীতি (Conventions) ১৬

বিশ্ব সভ্যতার ক্রমরূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা এমনটি জেনেছি যে, মানুষ আগুনের যুগ বা পাথরের যুগের মতো আদিযুগ অতিক্রম করে কৃষিযুগে পা ফেলে। আদিযুগে মানুষ প্রধানত প্রকৃতিনির্ভর ছিলো। সেই সময়ে মানুষকে শিকারী প্রাণীও বলা হতো। প্রকৃতিকে মোকাবেলা করতো সে এবং প্রকৃতিকে নির্ভর করেই তার জীবন যাপিত হতো। বস্তুত কৃষিযুগ ছিলো মানুষের সৃজনশীলতার প্রথম ধাপ যখন সে উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। সে জ্ঞান অর্জন করে কেমন করে বীজ বপন করতে হয়, কেমন করে বীজ থেকে চারা ও বৃক্ষ হয় এবং সেই বৃক্ষের ফল সে নিজে খাবার জন্য ব্যবহার করতে শেখে। সে কোনটি খাবার ও কোনটি খাবার নয় সেটিও শেখে। প্রকৃতির কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়ে সে সভ্যতার চাকাকে সামনে নেয়। আগুন আবিষ্কারই সম্ভবত মানুষের প্রথম উদ্ভাবন। দিনে দিনে সে আরও নতুন প্রযুক্তি আয়ত্ব করে। চাকার আবিষ্কারও মানুষের এক অসাধারণ উদ্ভাবন। গাছে পানি দিলে তার বৃদ্ধি ঘটে, সার দিলে সে বেড়ে ওঠে ইত্যাদি তার শেখা হয়। সে শিখে মাটি কর্ষণ করলে ফসলের ফলন বাড়ে। দিনে দিনে সে ফসলের বৈচিত্র আনতে পারে এবং তার কৃষিজ্ঞানের নিরন্তর বিকাশ ঘটে।

বিশ্বজুড়ে বিকশিত এমন কৃষি সভ্যতার আমূল রূপান্তর ঘটে ইংল্যান্ডে। এটিকে যান্ত্রিক যুগ বা শিল্প বিপ্লবের সূচনা বলা হয়। মনে করা হয় যে, ইংল্যান্ডের এই বিপ্লবকে স্মৃতিতে ধারণ করে এক আমেরিকান মার্কিন মুলুকে শিল্প বিপ্লবের সূচনা করেন। এরপর শিল্প বিপ্লব ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ে। সেটিকে এখন সবাই শিল্প বিপ্লবের প্রথম স্তর বলে চিহ্নিত করে। প্রধানত কৃষিনির্ভর, গ্রাম্য ইউরোপ ও আমেরিকাকে যন্ত্রনির্ভর ও শহরে হিসেবে গড়ে তুলে এই শিল্প বিপ্লব। হাতে তৈরি যন্ত্র, কায়িক শ্রম ইত্যাদির সহায়তায় কুটির শিল্পের মতো যে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিলো তাতে বিশেষায়িত যন্ত্র, কারখানা ও শক্তির সংযুক্তি ঘটে। আসে গণ উৎপাদনের সময়। লোহা ও বস্ত্র শিল্প এর সাথে বাষ্পীয় কলের উদ্ভাবন উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদির সূচনা হয়। একই সাথে শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেননি এমন মানুষেরা চরম বিপদের মুখোমুখী হয়। কর্মহীনতা ও সামগ্রিক পরিস্থিতি তাদেরকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করে। অবশ্য শিল্প বিপ্লবের আগেও তাদের জীবন দুঃসহই ছিলো। শিল্প বিপ্লবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা উনিশ শতকে ইংল্যান্ডে শত শত কারখানায় হামলা চালিয়েছিলো, যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করেছিলো ও হাজার খানেক হরতাল বা ধর্মঘট করেছিলো। নেড লুট নামক এক ইংরেজ এর নেতৃত্ব দিয়েছিলো বলে সেইসব কর্মকাণ্ডকে লুডিটি বলা হতো। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনা ১৮৭১ সালের লগ্নে জাপান শিল্পবিপ্লবে যোগ দেয়। এশিয়ায় শিল্পবিপ্লবের বিকাশে জাপানের ভূমিকা অপরিসীম।

আমরা যখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তখনও সম্ভবত নেড লুটের মতো নেতা ও তার অনুসারীদের সৃজন হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে প্রচলিত জ্ঞান নিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে টিকে না থাকার সম্ভাবনা। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রচলিত কারখানা, প্রচলিত শ্রম, অফিস-আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য, সরকার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও জীবনধারার অকল্পনীয় রূপান্তর ঘটছে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এটি অন্যদের-বিশেষত শিল্পোন্নত ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর দেশগুলোর চাইতে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জযুক্ত।

আমরা স্মরণ করতে পারি, প্রথম শিল্প বিপ্লবের ধাক্কাটা সামাল দেবার পর বিশ্ব প্রধানত প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তার জীবন মানের উন্নতি ও সভ্যতার বিবর্তণে প্রযুক্তিকেই কাজে লাগিয়েছে। সেই কারণেই ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পরের সময়টাকে দ্বিতীয় এবং ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেটের সূচনার পরের স্তরকে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব বলে চিহ্নিত করা হলেও প্রযুক্তির প্রভাবে বিশ্ব তেমন বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়নি। বরং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি সারা বিশ্বের মানুষের জীবন মানকে অসাধারণ উচ্চতায় স্থাপন করেছে। তবে লক্ষনীয় যে মানব

সভ্যতার বিকাশে আদিযুগ, কৃষি যুগ, শিল্প বিপ্লবের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর যে পরিমাণ প্রলম্বিত ছিলো তৃতীয় শিল্প বিপ্লবও ততোটা সময় জুড়ে বিস্তৃত থাকেনি। বরং ১৯৬৯ সালে শুরু হওয়া একটি যুগ ২০১৬ সালেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সময় বলে আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আলোচিত হবার শুরুতেই আলোচনায় আসছে পঞ্চম সমাজের কথা। জাপান পঞ্চম সমাজের কথা বলছে। এই সমাজকে তারা অতি আধুনিক ডিজিটাল সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কর্মসূচিটি জাপানের বলেই বয়স্ক জনগোষ্ঠীসহ তাদের সমাজের ডিজিটাল রূপান্তরের কথা বলছে। তারা বলছে যে অত্যাধুনিক ডিজিটাল সমাজ গড়তে তাদের পাঁচটি দেয়াল ভাঙতে হবে। আমাদের অবস্থা জাপানের মতো না হলেও জাপানের অত্যাধুনিক (স্মার্ট ডিজিটাল সমাজ) এর অনেক বিষয় নিয়েই আমাদেরকে ভাবতে হবে। তবে এটি লক্ষ্য করা যায় যে আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি সেটির বাস্তবায়নই বিশ্বের অন্য দেশসমূহের কর্মসূচিকে অতিক্রম করে যাবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বা অত্যাধুনিক ডিজিটাল সমাজ ৫.০ এর সময়ে আমাদের জন্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো বিষয়ই রয়েছে। আমরা তিনটি শিল্প বিপ্লবে তেমন শরীক না হবার ফলে সেই তিন বিপ্লবের ভুলগুলো না করার ইতিবাচক সময়ে রয়েছি। অন্যদিকে তিনটি শিল্প বিপ্লব মিস করার জন্য আমাদের চ্যালেঞ্জটা বেড়েছে। শিল্পায়নের সূত্র ধরে শিল্পোন্নত দেশগুলোর মানুষের জীবনের জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও জীবনধারা আমাদের পশ্চাদপদ জীবনধারা বদলানোর জন্য এমন সব চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে যা শিল্পোন্নত দেশগুলোর নেই। আমরা জানি তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই বিশ্বসভ্যতা ডিজিটাল যুগে পা দিলেও এখন বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, আইওটি, বিগডাটা এবং ৫জি মোবাইল ব্রডব্যান্ডের যুগের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে আছে। আমরা যারা দুনিয়ার ডিজিটাল বিপ্লব, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ডিজিটাল সমাজ, সৃজনশীল অর্থনীতি, ডিজিটাল অর্থনীতি, ই-দেশ, ইউবিকুটাস দেশ, সমাজ ৫.০ ইত্যাদি বলছি তাদেরকেও বুঝতে হবে নতুন প্রযুক্তিসমূহ বিশ্বকে একটি অচিন্তনীয় যুগে নিয়ে যাচ্ছে। এখনই এইসব প্রযুক্তিসমূহের অতি সামান্য প্রয়োগ সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবার ঘটনা ঘটাচ্ছে। আগামীতে আমরা এসব প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়াতে পারব কিনা সেটিই ভাবনার বিষয়।

অন্যসব আলোচিত নবীন প্রযুক্তি যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, আইওটি, ব্লক চেইন ইত্যাদির আলোচনা যদি কমও করি তবুও এটি বলতেই হবে যে, মোবাইলের প্রযুক্তি যখন ৪জি থেকে ৫জিতে যাচ্ছে তখন দুনিয়া একটি অভাবনীয় রূপান্তরের মুখোমুখী হচ্ছে। আমরা ৫জির প্রভাবকে যেভাবে আঁচ করছি তাতে পৃথিবীতে এর আগে এমন কোন যোগাযোগ প্রযুক্তি আসেনি যা সমগ্র মানবসভ্যতাকে এমনভাবে আমূল পাল্টে দেবে। ২০২০ সাল নাগাদ এই প্রযুক্তি বিশ্ববাসী ব্যাপকভাবে ব্যবহার করবে। মোবাইলের এই প্রযুক্তি ক্ষমতার একটু ধারনা পাওয়া যেতে পারে এভাবে যে আমরা এখন যে ৪জি প্রযুক্তি ব্যবহার করছি তার গতির হিসাব এমবিপিএস এ। অন্যদিকে ৫জির গতি জিবিপিএস এ। এমন ৫জির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, আইওটি, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন বা এ ধরনের যুগান্তকারী ডিজিটাল প্রযুক্তি যেমনি করে নতুন সুযোগ তৈরি করবে তেমনি করে নতুন চ্যালেঞ্জেরও জন্ম দিচ্ছে। আমাদের জন্য এটি খুবই প্রয়োজনীয় হবে যে আমরা যেন প্রযুক্তিকে আমাদের জনগোষ্ঠী, সমাজ-সংস্কৃতি ও দেশ-কালের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করতে পারি।

এসব প্রযুক্তি একদিকে জীবনকে বদলে দেবে, অন্যদিকে কায়িক শ্রমকে ইতিহাস বানিয়ে দেবে। আমাদের মতো জনবহুল কায়িক শ্রম নির্ভর দেশের জন্য এটি একটি মহাচ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে আমাদের মতো তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশের জন্য সেই জনগোষ্ঠীকে এসব প্রযুক্তিজ্ঞানসমৃদ্ধ করে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব জয় করার একটি অপার সম্ভাবনাও তৈরি করবে এইসব প্রযুক্তি।

বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে নিজেকে একুশ শতক অবধি টেনে এনেছে। খুব সাম্প্রতিককালে কিছু মৌলিক শিল্পায়ন ছাড়া দেশটি কৃষিনির্ভরই ছিলো। তবে জিডিপির চিত্রটা এরই মাঝে দারুনভাবে বদলে গেছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিলো মাত্র শতকরা ১৯ ভাগ। সেবা খাত কৃষি ও শিল্পকে অতিক্রম করে জিডিপিতে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি অবদান রাখতে শুরু করেছে। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ দেশটির সামগ্রিক রূপান্তর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্ব এমন অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। বিশেষ করে তার নেতৃত্বে ঘটা আমাদের ডিজিটাল রূপান্তর এমন এক সুযোগ তৈরি করেছে যা এর আগে আমরা কখনও ভাবতেও পারিনি।

শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্ব ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত রচনা করেছে। এই দেশে কম্পিউটার আসে ৬৪ সালে। তবে ৮৭ সাল থেকে ঘটে যাওয়া ডিটিপি বিপ্লবের আগে কম্পিউটারের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্কও ছিলোনা। বিশেষজ্ঞরাই কম্পিউটার চর্চা করতেন। ডিটিপি ও কম্পিউটারে বাংলা ভাষার ব্যবহার ডিজিটাল প্রযুক্তিকে তৃণমূলের সাথে সম্পৃক্ত করে তোলে। তবে প্রকৃত ডিজিটাল বিপ্লবের সূচনা ঘটে জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সেই সময়ে ৯৮/৯৯ সালের বাজেটে তিনি কম্পিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও ভ্যাট সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করেন, মোবাইলের মনোপলি ভাঙেন, অনলাইন ইন্টারনেটকে সচল করেন ও দেশে দশ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই সময়ে কেমন করে বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার রপ্তানী করা যায় তার সুপারিশের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। সেই টাস্কফোর্স ৪৫টি সুপারিশ পেশ করে যা সরকার গ্রহণ করে ও বেশির ভাগ সুপারিশ বাস্তবায়ন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেখ হাসিনার ডিজিটাল রূপান্তরের স্বপ্ন থেমে যায় ২০০১ সালে সরকার বদলে যাবার ফলে। এরপর আবার বাংলাদেশের ডিজিটাল নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর। সেই নির্বাচনের আগেই ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করার সময় রূপকল্প ২০২১ এর অংশ হিসেবে ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা প্রদান করেন। স্মরণ করা উচিত যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণার পর ব্রিটেন ২০০৯ সালের ২৯ জানুয়ারি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট নিজেদের দেশকে ডিজিটাল দেশে রূপান্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ব্রিটেনের কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিলো ২০১২ সালের মাঝে ব্রিটেনবাসীর ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পৌঁছানো ও অন্তত ২ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট প্রদান করা। পরে অবশ্য ব্রিটেন সেই কর্মসূচির সম্প্রসারণ করেছে। ভারত সরকার ১লা জুলাই ২০১৫ ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচি মূলত ভারতের সরকার ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করা, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ভারতজুড়ে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন করা।

এখন বস্তুত বিশ্বের সকল দেশ ইলেকট্রনিক, ইউবিকুটাস বা ডিজিটাল শব্দ দিয়ে তাদের ডিজিটাল যুগের কর্মসূচি প্রকাশ করছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো যে, বাংলাদেশের আগে অন্য কেউ ডিজিটাল শব্দটি ব্যবহার করেনি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম যেমন করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে গুরুত্ব দিচ্ছে তেমনি বিশ্ব তথ্যসংঘ সমাজ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে কেবল একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশেই পরিণত করতে চাননি, তিনি একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাও ঘোষণা করেছেন। ২০১৪ সালে ঘোষিত তার দলের নির্বাচনী ইশতেহারে তিনি এই ঘোষণা প্রদান করেন। বিশ্বের বহু দেশ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সৃজনশীল অর্থনীতি, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং সর্বত্র বিরাজমান প্রযুক্তির কর্মসূচির কথা বলে

যাচ্ছে। তবে অনেক দেশই এমন নতুন পরিস্থিতির প্রকৃত রূপটা উপলব্ধি করতে পারেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ভাগ্যবান যে তার নেত্রী শেখ হাসিনা, যিনি পঞ্চাশ বছর সামনে দেখার দূরদর্শিতার অধিকারিনী।।

আমরা বাংলাদেশের জনগণ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার সংগ্রাম করছি বলেই প্রযুক্তি ও সভ্যতায় পিছিয়ে থাকতে পারিনা। একাত্তরে রক্ত দিয়ে যে দেশটাকে আমরা গড়েছি সেই দেশটা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশ হবে এটিই জাতির জনকের স্বপ্ন ছিলো। আমরা সেই স্বপ্নেই মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই স্বপ্নপূরণে তার জীবন ও কর্মকে উৎসর্গ করে যাচ্ছেন।

আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রযুক্তি ও জীবনধারায় পেছনে থাকার বদলে দুনিয়াকে ডিজিটাল যুগে নেতৃত্ব দেয়া। আমাদের জন্য স্বপ্ন হচ্ছে ২০২১ ও ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়ন করা।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা হচ্ছে তেমন একটি দলিল যাতে আমরা আমাদের ২১ ও ৪১ এর রূপকল্পকে বাস্তবায়ন করার পথরেখার বিবরণ প্রদান করছি। এখনকার সময়ে অবস্থান করে ৪১ সালের অবস্থাটি আমাদের জন্য আন্দাজ করাও দুরুহ। এমনকি ২১ সালে আমরা কেমন পৃথিবীতে বাস করবো সেটিও অনুমান করা কঠিন। তবুও আমরা কিছু মৌলিক ও কৌশলগত বিষয় চিহ্নিত করে একটি কর্ম পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করছি। বলার অপেক্ষা রাখেনা এর সবই পরিবর্তনশীল। ২১ ও ৪১ এর লক্ষ্যটা স্থির রেখে সময়ে সময়ে এর আনুসঙ্গিক বিষয়াদি আপডেট করতে হবে। যেসব মৌলিক উপাদান আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে সেগুলোর মাঝে রয়েছে দেশের সকল মানুষের জন্য ডিজিটাল সংযুক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠা ও ডিজিটাল শিল্পখাতের বিকাশ। আমরা মনে করি এর ফলে আমাদের জনগণ একটি ডিজিটাল জীবনধারায় বসবাস করবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ যে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ করার প্লাটফরম রচনা করবে সেটিও আমরা ভাবছি। আমরা দেশটিকে ডিজিটাল অর্থনীতি, সৃজনশীল অর্থনীতি, মেধাভিত্তিক শিল্পযুগ বা সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অন্তত চারটি সময়কালের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার সূচনা ২০০৩ সালে হলেও বস্তুত সার্বিক দিকগুলো ও কর্ম পরিকল্পনাসহ প্রথম পূর্ণাঙ্গ একটি নীতিমালা প্রণীত হয় ২০০৯ সালে। সরকার, শিল্পখাত, একাডেমিয়াসহ সকলের মতামত নিয়ে প্রণীত হয়েছিলো সেই নীতিমালাটি। সেই অনন্য নীতিমালাটি নবায়ন হয় ২০১৫ সালে। শুরুর প্রায় এক দশক পর আমরা ২০০৯ সালের নীতিমালাটিকে একদম নতুন করে গড়ে তুলছি। ২১ ও ৪১ সালকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে এই সময়ের বিশ্ব সভ্যতার রূপান্তর, বিগত সময়কালে আমাদের নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যমান প্রযুক্তির সাথে আগামী দিনের প্রযুক্তিকে বিবেচনায় রেখে এই নীতিমালা প্রণীত হলো। ২০০৯ ও ১৫ সালের নীতিমালার আলোকে বিগত সময়ে বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরে বিপুল কর্মযজ্ঞ আয়োজিত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। সমগ্র দেশে ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ, ৪জির প্রবর্তন, জনগণের হাতে সরকারি সেবা পৌছানো তথা সরকারের ডিজিটাল রূপান্তর, শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর, ডিজিটাল যুগের উপযোগী মানব সম্পদ উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে ডিজিটাল শিল্পের বিকাশ ও জনগণের জীবনযাপনের মান উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তলাহীন ঝুড়ির দেশ বা প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছর পেছনে পড়া দেশ এখন বহু ক্ষেত্রে বিশ্বকে পথ দেখায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অনুন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবার প্রেক্ষিতে আমাদের এই নীতিমালা অসাধারণ ভূমিকা পালন করবে।

আমরা বিবেচনায় রেখেছি যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। এরফলে, নীতিমালায় বর্ণিত কিছু করণীয় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ক্ষেত্র বিশেষে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে এদেশের

উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা যায় সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। এছাড়া সরকারের রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ (এসডিজি) ও রূপকল্প-২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জন এবং বৈশ্বিক পরিবর্তনশীলতাকে ধারণ করতেই 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৫' কে নতুন করে প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়। এ বাস্তবতায় 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলে বাংলাদেশকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' প্রণয়ন করা হলো।

DRAFT

অধ্যায়-১

নীতিমালার নাম, পরিধি ও সংজ্ঞা

১.১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

ক. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এ নীতিমালা 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

খ. প্রবর্তন : এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১.২. সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

(১) "**অটোমেশন (Automation)**" এটি একটি যান্ত্রিক বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি বা যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারে; ফলে কার্য সম্পাদনে মানুষের হস্তক্ষেপ কমে যায়;

(২) **"আন্তঃপরিবাহিতা (Inter-operability)"** কম্পিউটার সিস্টেমের কম্পোনেন্টসমূহ যা বিভিন্ন Enviroment -এ পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান করে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম;

(৩) **"ডিজিটাল সরকার (Digital Government)"** হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া (system), যার মাধ্যমে কোন কম্পিউটার/ডিজিটাল ডিভাইস এবং/অথবা ডিজিটাল সংযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি কার্যক্রম দক্ষভাবে সম্পাদন করা যায় এবং সেবাসমূহ দ্রুত জনগণের নিকট পৌঁছানো যায়;

(৪) **"Enterprise Resource Planing (ERP)"** হলো একটি সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা প্রতিষ্ঠানের সমস্ত তথ্যবলী (Data) সমন্বিতভাবে উপস্থাপন করে, যার ফলে দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়;

(৫) **"কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial intelligence)"** ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে সৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা যা মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুরূপ বা কাছাকাছি কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে;

(৬) **"ডিজিটাল কমার্স (Digital Commerce)"** অর্থ ইলেক্ট্রনিক/ডিজিটাল বাণিজ্য যা ইন্টারনেট ও অন্যান্য ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সকল প্রকার পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হয়ে থাকে;

(৭) **"ডিজিটাল ডিভাইড (Digital Divide)"** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ (Access), ব্যবহার অথবা এর প্রভাব (Impact) এর মাধ্যমে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক অসাম্য;

(৮) **"ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)"**অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা তথ্য প্রক্রিয়া করণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহারের মাধ্যমে যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা ডিজিটাল নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত, এবং

DRAFT

সকল ইন পুট, আউট পুট, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চিতি, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও এর অন্তর্ভুক্ত;

(৯) **"ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security)"** অর্থ কোনো ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল সিস্টেম এর মধ্যস্থিত তথ্য-উপাত্ত ও কর্মপ্রক্রিয়ার নিরাপত্তা;

(১০) **"ডিজিটাল লেনদেন (Digital Payment)"** অর্থ ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদিত যে কোনো ডিজিটাল বাণিজ্য বাবদ লেনদেন ব্যবস্থা;

(১১) **"ডিজিটাল স্বাক্ষর (Digital Signature)"** অর্থ এমন একটি বিশেষ ডিজিটাল কোড যা কোনো লিখিত ডকুমেন্ট এর কনটেন্ট-এ প্রেরক বা স্বাক্ষরকারীর পরিচয়, উৎস, স্বত্ব, কর্তৃত্ব ও যথার্থতা এমনভাবে সনাক্ত ও নিশ্চিত করে যার কোনো একটি অংশ পরিবর্তন করলে সে ডিজিটাল কোড তা সঠিক বলে অনুমোদন প্রদান করে না এরূপ স্বাক্ষর ব্যবস্থা;

(১২) **"মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights)"** অর্থ কোনো ধরনের মুদ্রণ, সম্প্রচার বা ডিজিটাল উপায়ে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধাভিত্তিক মূলধনের ওপর উদ্ভাবক বা উৎপাদনকারী বা স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ মালিকের একচ্ছত্র বা একচেটিয়া আইনগত অধিকার সুরক্ষা ও স্বত্ব বহাল থাকে এরূপ অধিকার।

DRAFT

অধ্যায়-২

রূপকল্প ও উদ্দেশ্য

২.১. রূপকল্প (Vision)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা; দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন; সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি/বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞান ভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা।

২.২. উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives)

২.২.১. **ডিজিটাল সরকার (Digital Government):** সরকারের সকল কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সেবাসমূহ সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং একটি কারিগরী ও দক্ষ তথ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

২.২.২. **ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security):**সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত করা;

২.২.৩. **সামাজিক সমতা এবং সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access)**: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের তথ্য প্রবাহে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;

২.২.৪. **শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation):** শিক্ষা ও গবেষণা কাজে তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ও পরিচর্যার মাধ্যমে একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠন করা এবং উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে সমর্থন (Promote) ও প্রণোদনা (Incentive) প্রদান করা;

২.২.৫. **দক্ষতা, উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Skill Development and Employment Generation):** উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

২.২.৬. **অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening Domestic Capacity)**: স্থানীয়ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও সেবা প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

২.২.৭. **পরিবেশ, জলবায়ু ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management)**: জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাসকল্পে আইসিটি খাতে পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং আত্মীকরণ, ইলেকট্রনিক বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

২.২.৮. **উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity)**: দেশের স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সকল শিল্প খাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য **কার্যকর** পদক্ষেপ গ্রহণ।

DRAFT

অধ্যায়-৩

কৌশলগত বিষয়বস্তু

৩.১. ডিজিটাল সরকার (Digital Government)

৩.১.১. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণকে ডিজিটালি প্রদান নিশ্চিতকরণ;

৩.১.২. ডিজিটালপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৩. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনসাধারণের নিকট ডিজিটালি পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাতে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ;

৩.১.৪. সরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণকে ডিজিটালি প্রদানে সেবা প্রদানকারীর সক্ষমতা উন্নয়ন;

৩.১.৫. সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সহজে তথ্যের আদান প্রদানের নিমিত্ত Architectureও আন্ত:পরিবাহিতা (Inter-operability) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.১.৬. জাতীয় সংসদের ডিজিটাইজেশন ও সে অনুযায়ি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন;

৩.১.৭.বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন ও সে অনুযায়ি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন;

৩.১.৮.আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ডিজিটাইজেশন ও সে অনুযায়ি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন।

৩.২. ডিজিটাল নিরাপত্তা (Digital Security)

৩.২.১. ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ডিভাইসসমূহে যথাযথ মানসম্পন্ন হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যার এর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.২.২. ইন্টারনেট এর নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.২.৩. ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর কনটেন্ট উপস্থাপনে প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.৫. ক্ষতিকর ডিজিটাল বিষয়বস্তু থেকে নারী ও শিশুদেরকে সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.২.৬. তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তায় যথাযথ নিয়মনীতি এবং প্রমিতমান অনুসরণ;

৩.২.৭. আর্থিক লেনদেনে তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.২.৮. সরকারি গোপনীয় ও সংবেদনশীল তথ্যাবলী আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার।

৩.৩. সামাজিক সমতা এবং সর্বজনীন প্রবেশাধিকার (Social Equity and Universal Access)

৩.৩.১. সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে নিম্নবিত্ত শ্রেণী, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, নারী ও প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে আনয়ন;

৩.৩.২. গ্রামীণ জনপদে নগরের সমান সুবিধা নিশ্চিতকরণে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের ব্যবস্থাগ্রহণ;

৩.৩.৩. সরকারি/বেসরকারি সেবাসমূহ জনগণের কাছে ডিজিটাল-বৈষম্যহীনভাবে (ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকৃতভাবে) পৌঁছানো;

৩.৩.৪. সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম এবং নীতি নির্ধারণে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান;

৩.৩.৫. মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসহ বাংলাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সকল অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৩.৬. তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিককে দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৩.৭. ডিজিটাল প্রযুক্তির সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৪. শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবন (Education, Research and Innovation)

৩.৪.১. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ও নিয়মিত যুগোপযোগীকরণ এবং শিক্ষার সকল স্তরে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার (ICT for Education) করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.৪.২. বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যসূচিকে হালনাগাদ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি;

৩.৪.৩. গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৪.৪. তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৪.৫. গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সৃষ্ট পণ্য ও সেবাকে প্রয়োজনীয় বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৪.৬. নতুন নতুন উদ্ভাবনসমূহের মেধাস্বত্ব সৃষ্টি ও সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৪.৭. বিশেষ/একীভূতশিক্ষায় (আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, শারিরীক, মানসিক ইত্যাদি কারণে বঞ্চিত মানুষের জন্য যে শিক্ষা) আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৩.৪.৮. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৫. দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Skill Development and Employment Generation)

৩.৫.১. দেশীয় ও বিশ্ববাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসিটি পেশাজীবী তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন;

৩.৫.২. দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পেশাগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৫.৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্তকরণ;

৩.৫.৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা ও প্রণোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৫.৫. ভবিষ্যত প্রযুক্তি ও শিল্প খাতের বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.৬. অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা বৃদ্ধি (Strengthening Domestic Capacity)

৩.৬.১. বাংলাদেশী আইসিটি পণ্য ও সেবা বিশ্ববাজারে বাজারজাতকরণের জন্য শক্তিশালী বিপণন ও ব্র্যান্ডিং এবং দেশ হিসেবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিংকরণ;

৩.৬.২. দেশব্যাপী সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ এবং নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৩.৬.৩. IT/ITES শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.৬.৪. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং শিল্প-বান্ধব নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি;

৩.৬.৫. ব্যবসা বাণিজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি;

৩.৬.৬. সকল ক্রয়ে স্থানীয় পণ্য ও সেবার অগ্রাধিকার প্রদান এবং সে লক্ষ্যে স্থানীয় কোম্পানিসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৩.৭. পরিবেশ, জলবায়ু এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Environment, Climate & Disaster Management):

৩.৭.১. পরিবেশ রক্ষায় আইসিটি প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৩.৭.২. পরিবেশ-বান্ধব সবুজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ সংরক্ষণ উৎসাহিতকরণ;

৩.৭.৩. দুর্যোগ সতর্কীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকি নিশ্চিতকরণ;

৩.৭.৪. ডিজিটাল বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

৩.৭.৫. জলবায়ু পরিবর্তনে ডিজিটাল প্রযুক্তি করণীয় নির্ধারণ।

৩.৮. উৎপাদনশীলতা বাড়ানো (Enhancing Productivity)

৩.৮.১. সকল শিল্প খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.৮.২. যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.৮.৩. স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.৮.৪. কৃষিখাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৩.৮.৫. জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে ডিজিটাল কমার্স, ডিজিটাল লেনদেন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পকে উৎসাহিতকরণ এবং শিল্প বানিজ্যের ডিজিটাল রুপান্তর।

DRAFT

অধ্যায়-০৪
নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার, তদারকি এবং পর্যালোচনা

৪.১. নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার এবং তদারকি (Policy Ownership and Monitoring)

জাতীয় জীবনে এই নীতিমালা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক-হোল্ডারকে এই নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকারী হতে হবে। সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও আলোচ্য নীতিমালার স্বত্ত্বাধিকার নিশ্চিত হতে হবে। সে অনুযায়ী এই নীতিমালার নিম্নরূপ স্বত্ত্ব বিবেচনা করা হয়েছে:

৪.১.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ নীতিমালার তদারকি ও সমন্বয় সাধন করবে;

৪.১.২. সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব ক্ষেত্রে আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে;

৪.১.৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ নীতিমালার কর্মপরিকল্পনা সমূহ পরিবীক্ষণ করবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্মপরিকল্পনাসমূহের মূল্যায়ন করবে।

৪.২. নীতিমালা পর্যালোচনা (Policy Review)

৪.২.১. নিত্য নতুন পরিবর্তনের আঙ্গিকে বিশেষ লক্ষ্যসমূহকে পুনঃনির্ধারণের জন্য নীতিমালার কৌশলগত বিষয়গুলো প্রতি তিন বছর অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।

৪.২.২. এছাড়া নীতিমালা বাস্তবায়নের সফলতা ও ব্যর্থতার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী করণীয় বিষয়াদির সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত প্রতি পাঁচ বছর পর পূর্ণ নীতিমালাটি পর্যালোচনা করা হবে।

৪.৩. কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা (Action Plan Review)

৪.৩.১. ভবিষ্যতে কর্মপরিকল্পনা অংশে (পরিশিষ্ট-১) যে কোনো ধরনের হালনাগাদকরণ, সংশোধন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে এবং কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অবস্থা যাচাই, করণীয় বিষয়সমূহের পরিবর্তন ও অগ্রাধিকার নিরূপণের জন্য প্রতিবছর করণীয় বিষয়সমূহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগকর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে। হালনাদকৃত কর্মপরিকল্পনাসমূহ এ নীতিমালার অংশ হিসেবে কার্যকর হবে।

DRAFT

অধ্যায়-০৫

কাঠামো ও অনুসৃত রীতি

৫.১. কাঠামো (Structure)

৫.১.১. পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ নীতিমালায় একটি রূপকল্প, আটটি উদ্দেশ্য, বায়ান্নটি কৌশলগত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

৫.১.২. এ নীতিমালার আওতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত করণীয় বিষয়কে কর্ম-পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ করে **পরিশিষ্ট-১** আকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

৫.১.৩. রূপকল্প ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে। বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে কৌশলগত বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, যার সুফল ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

৫.২. অনুসৃত রীতি (Conventions)

৫.২.১. কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ‘রূপকল্পঃ ২০২১’, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ‘রূপকল্পঃ ২০৪১’ বিবেচনায় নিয়ে নিম্নরূপ মেয়াদ স্থির করা হয়েছেঃ

- স্বল্প মেয়াদী (২০২১ সাল);
- মধ্য মেয়াদী (২০২৫ সাল)
- দীর্ঘ মেয়াদী (২০৩০ সাল); এবং
- অতি দীর্ঘ মেয়াদী (২০৪১ সাল)।

৫.২.২. যে সকল করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগতে পারে, সেগুলো একাধিক মেয়াদব্যাপী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।

DRAFT